২১-০৭-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরানো দুনিয়ায়, পুরানো শরীরে কোনও আনন্দ নেই, তাই বেঁচে থেকেও মৃতবৎ ভাব নিয়ে বাবার একান্ত হয়ে যাও, প্রকৃত বহ্নি-পতঙ্গের মতন হও।

প্রশ্ন ১) :- সঙ্গমযুগের আদব-কায়দা কি ?

উত্তর :- বাচ্চারা, এই সঙ্গমযুগে তোমরা এখানে বসে বসেই তোমাদের শ্বশুর-বাড়ী বৈকুন্ঠধামে অর্থাৎ স্বর্গধামে ঘুরে আসতে পারো। এটাই সঙ্গমযুগের বিশেষ আদব-কায়দা। এই সময় কালেই সূক্ষ্মবতনের রহস্য উন্মোচন হয়।

প্রশ্ন ২) :- কি এমন পদ্ধতির দ্বারা অতি সহজেই তোমাদের দারিদ্রতা ও দুঃখকে ভুলে যেত পারো?

উত্তর :- অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করলে দারিদ্রতা ও দুঃখ সব ভুলে যাবে। বাবা তো কেবল গরীব বাচ্চাদের কাছেই আসেন- তাদেরকে ধনবান বানাবার জন্য। বাবা কেবলমাত্র গরীব বাচ্চাদেরকেই পোষ্য নেন।

গীত:- জলসাঘরে জ্বলে ওঠে ঝাড়বাতির শিখা, তাহাতেই পুড়ে মরা পিঁপিলিকার লিখা.....

ওঁম্ শান্তি! আত্মাদের প্রেম-ভালবাসা তাদের পারলৌকিক বাবা, পরমাত্মার সাথে। যেহেতু তারা জানে বাবা তাদেরকে সাথেই নিয়ে যাবেন। যখন কারও আত্মা শরীর ছেড়ে যেতে চায়, তার পূর্বে তার জন্য কত কিছু করতে থাকে, তখন কত প্রকারের কাহিনী শোনানো হয়, যেমন 'সাবিত্রি-সত্যবান'-এর কাহিনী শোনানো হয়। যাতে আত্মা দেহের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দেহতেই ফিরে আসে। অথচ তখন সেই আত্মার তো এসবের কোনও জ্ঞানই থাকে না। অবশ্য তোমাদের সে জ্ঞান আছে। আমাদের (বি কে-দের) প্রত্যেকেরই ভালবাসা ঐ এক পরমপিতা পরমাত্মার সাথে। কিন্তু এই ভালবাসা জন্মালোই বা কেন ? -আত্মহুতি দেবার জন্য। বাবার এই ভালবাসা খুবই সুন্দর। ভক্তি-মার্গে থেকে অর্দ্ধ-কল্প ধরে আত্মারা কেবল ঠোক্কর খেয়েই এসেছে, নিজেদের ঘর শান্তিধামে যাবার জন্য। এ কথা অবশ্য সত্য। তাই তো বাবাও বলেন, অশরীরী হয়ে নিজেকে আত্মহুতি দাও। আত্মা যখন শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায়-তাকেই আত্মহুতি বলা হয়। বাবা এভাবে বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, এই দুনিয়া অথবা দুনিয়ার আর যা কিছু বন্ধন আছে, তা থেকে মরে যাও অর্থাৎ তবেই আমার হয়ে যাবে। এই পুরোনো শরীর আর পুরোনো জরাজীর্ণ দুনিয়াতে যে কোন মজাই নেই। একেবারে ছিঃ ছিঃ দুনিয়া এটা। এখন কী ভয়ঙ্কর আতঙ্কের নরক এটা। তাই তো বাবা বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা আমার সাথে একান্ত আপন হয়ে যাও, আমি তো সেই কারণেই এসেছি তোমাদের সুখধামে নিয়ে যেতে, যেখানে দুঃখের নাম-গন্ধও থাকে না। অতএব এমন প্রেমিকের প্রতি খুশীতে সমর্পিত হয়ে যাও। সমর্পণে খুশী তো অবশ্যই হবে, যেভাবে বহ্নি-পতঙ্গেরা আত্মহুতি দিতে উড়ে উড়ে আসে প্রদীপের শিখার দিকে। কোনও কোনও পতঙ্গ আবার এমনও হয়, প্রদীপের জ্যোতি জ্বলার সাথে সাথে জন্মগ্রহন করে-আবার পরে সেই প্রদীপ নিভে যাওয়ার সাথে সাথে, সেই পতঙ্গরাও মারা যায়। দীপমালা উৎসবের সময় অনেক সংখ্যায় ছোট ছোট সবুজ রং-এর (শ্যামা পোঁকা) পতঙ্গ আসে-প্রদীপের শিখায় আত্মহুতি দেবার লক্ষ্যে। শিখা নিভে যাবার সাথে সাথে তাদেরও মৃত্যু ঘটে। আর

এই বাবা তো মহা-জ্যোতি। বাবা বলছেন- তোমরাও তেমনি বহ্নি-পতঙ্গদের মতন বাবার প্রতি সমর্পিত হও। তোমরা কিন্তু চেতন সত্বার মানুষ, যারা এই দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছো। তাই জীবিত অবস্থায় বন্ধন-মুক্ত হও। যতক্ষণ তোমরা জীবিত আছো, নিজেদেরকে আত্মা অনুভব করে আমার (পরমাত্মার) সাথে যোগযুক্ত হও। যোগের খুশীতে থাকলে শরীরের ভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আমি আত্মা, এই দুনিয়া ত্যাগ করে আত্মাদের নিজস্ব ঘরে যাই। এই দুনিয়া এখন থাকার উপযুক্ত নয়, তাই এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না। বর্তমানের এই দুনিয়া গরীবদের দুনিয়ায় পরিণত হয়েছে। আর গরীব মানেই দুঃখী। তাই তো বাবা বলছেন- বাচ্চারা, এখন থেকে তোমরা অশরীরী ভাবে থাকতে চেষ্টা করো। আমরা আত্মারা তো প্রকৃতপক্ষে শান্তিধামের অধিবাসী। কিন্তু যতক্ষণ না পবিত্র হবে শান্তিধামে কেউ যেতে পারবে না। যেহেতু সবারই উড়তে পারা ডানার সেই পাঁখা এখন ভাঙ্গা। সবচাইতে বেশী ভঙ্গুর তার, যে নিজেকেই ভগবান মনে করে। তবে আর অন্যদেরকে সেখানে নিয়ে যাবেই বা কি প্রকারে! তারা যেখানে নিজেরাই পৌঁছতে পারে না-সেখানে তোমাদের সদগতি করবে কিভাবে ? তাই ভগবান স্বয়ং এমন বলেন, এই সাধু-সন্তদেরও আমাকেই উদ্ধার করতে হয়। নেশাগ্রস্থের মতন তারা কেবল এটাই বলতে থাকে কৃষ্ণ-ভগবান উবাচঃ, আসলে যা হবে শিব-ভগবান উবাচঃ। শিব তো অশরীরী। তাই সেক্ষেত্রে অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারাই প্রজাদের (বি কে-দের) বোঝাবে। যেহেতু মানুষদের রচনা করানো হয় ব্রহ্মার দ্বারা। এ বিশ্বাস জগতের সবারই। যদি কারও কাছে জানতে চাও, কেন তারা এমনটা মনে করে, প্রতি সময়েই (কল্পে) তো এই বাবার দ্বারাই বাচ্চাদের রচনা হয়। বাবা তার বাচ্চাদের রচনা করেন বাবার উত্তরাধিকারীর আশীর্ব্বাদী বর্সা দেবার জন্য। তেমনি এই ব্রহ্মা বাবার দ্বারাও ব্রাহ্মণদের রচনা করা হয়।

তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ, বাবা স্বয়ং আমাদের জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন, রাজযোগ শেখাচ্ছেন স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী বানাবার উদ্দেশ্যে। বাবা আসেন এই দুনিয়ার পরিবর্তন করতে। অর্থাৎ নরককে স্বর্গ বানাতে। এই মনুষ্য সৃষ্টি জগতকে দেব-দেবীদের জগৎ বানাতে। একমাত্র উনিই আসেন জগতকে সুখী করতে। যদিও এই দুনিয়ার মানুষ যতই লক্ষ-কোটি অর্থাৎ পদ্মাপদম্ ধন-সম্পত্তির মালিক হোক না কেন, যতই বিশাল বিশাল প্রাসাদ-অট্টলিকা বা গাড়ী-ঘোড়া থাকুক না কেন, কিন্তু তোমরা তা জানো, জ্ঞানের এই পাঠ কেবল তোমরাই পড়ছো আর তার দ্বারাই প্রকৃত উচ্চ-পদের অধিকারী হওয়া যায়। যারা জাগতিক পড়াশোনা করে তারা ভাবে যে, আমি ব্যারিস্টার হবো, আমি আই.এ.এস. (I.A.S. =Indian Administrative Service) হবো। কিন্তু তোমাদের বুদ্ধিতে এই নিশ্চয়তা আছে যে, শিববাবা আমাদেরকে যে জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন, তার দ্বারা আমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে পারব। যা বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ পদ, তার সাথে সাথে আবার আগামী ২১-জন্মের জন্য একেবারে নীরোগী হতেও পারবো। অসময়ে মৃত্যুও হবে না। কিন্তু তা হয় কেন ? --যারা বহ্নি-পতঙ্গের মতন বাবাকে একান্ত নিজের করে নেয়। বাবা তাকেই পোষ্য বানিয়ে কোলে তুলে নেন। এই জগতের ধনীরা তো আর এই দীনবন্ধু গরীব বাবার পোষ্য হবে না। বরঞ্চ গরীব বাচ্চারাই ধনী ব্যক্তির পোষ্য হয়। বর্তমানে পুরো জগৎটারই একেবারে নিতান্তই গরীব অবস্থা। তোমরা তো জানো, এইসব মহল-অট্টলিকা ইত্যাদি সবকিছুই বিনাশ হয়ে ধূলায় মিশে যাবে। আমরাই নুতন বিশ্বের মালিক হতে চলেছি। অনেক পূর্বে যেমন আমরাই মালিক ছিলাম, অবশ্য যা বর্তমানে নই, কিন্তু আবার আমরাই মালিক হবো। অন্যেরা আর কেউই সমগ্র বিশ্বের মালিক হবার অধিকার অর্জন করতে পারে না।

বাচ্চারা, কেবল তোমরাই সমগ্র বিশ্বেরই মালিক হও ২১-জন্মের জন্য। তোমাদের সবার জন্যই সেই স্বর্গীয় সুখ। এখানে তো ছোট-ছোট বাচ্চাদেরও মৃত্যু ঘটে। আবার এমনও অনেক ঘটনা ঘটে, রাজার ঘরে জন্ম নিয়েও, অল্প সময় পরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে-কেবল রাজপুত্র হিসাবে জন্ম নেওয়াটাই সার, রাজ্য-ভাগ্যের সুখ কিন্তু সে পেল না। বাচ্চারা, তোমাদের এই নিশ্চয়তা আছে- তোমরা তোমাদের ঈশ্বরীয় পিতার সামনেই বসে আছো। আত্মা শরীর ধারণ করে তার কর্মফলের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করে। এখন জেনে গেছো, এই আত্মাদের পিতা পরমাত্মা বাবা এই দুনিয়াতেই এসেছেন। পুরোনো যা কিছু বন্ধন আছে তা থেকে মুক্ত করে নতুন সম্বন্ধ স্থাপন করাতে। তোমরাই সূক্ষ্ম-বতন বৈকুন্ঠ ইত্যাদি জগতে গিয়েও সবার সাথে দেখা সাক্ষ্যাৎও করতে পারো। যেহেতু তোমরা সরাসরি বেহদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সত্যি কত সুন্দর ফ্যাসান এটা। এই পদ্ধতিতে নিজেদের শ্বশুর বাড়ীতেও যেতে পারো তোমরা। যেমম 'মীরা'-রও শ্বশুরবাড়ী বৈকুন্ঠেই ছিল। সে চাইত তার শ্বশুরবাড়ী বৈকুন্ঠে যেতে। বর্তমানের এই দুনিয়ায় কোথাও তোমার শ্বশুরবাড়ী নেই। এই দুনিয়া একেবারেই গরীবদের দুনিয়া। তাই তোমাদদের একেবারেই সম্বলহীন অবস্থা। আমাদের এই ভারতবর্ষ সর্বক্ষেত্রেই অনেক উন্নত ছিল, তাই তাকে সোনার ভারত বলা হতো - কিন্তু তেমন অবস্থা আজ আর নেই। এই মহিমা তখনকার, যখন তেমন ছিল। আর এখন দেখো, সেই সোনার ভারতের কী জরাজীর্ণ অবস্থা। গয়না-গাঁটি, ধন-রত্ন, ইত্যাদি যা কিছু সম্পদ ছিল, সবই দস্যুরা নিয়ে গেছে। এমন কি যা কিছু লোকানো ছিল, তাও ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সেই সব দামী দামী মণি-রত্ন মুসলমানদের কবরে লাগানোও হয়েছে। তখন অফুরন্ত হীরে-জহরত, সোনা-দানা ছিল। যার চিহ্ন এখনও স্পষ্ট। সোমনাথ মন্দিরে গেলেই তা বোঝা যাবে, তখনকার ভারত কত সম্পদশালী ছিল। আবার ইংরেজরাও সেসব নিয়ে গেছে। তার চিহ্ন আজও বর্তমান। এতেই বোঝা যায় তখনকার ভারত কত বিশাল ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। আর আজ সেই ভারতের কি দৈন্যদশা দেখো একবার।

যেহেতু তোমরা বাবার সন্তান হয়েছ, তাই বুঝতে পারছ, তোমরাই স্বর্গরাজ্যের মালিক হবে। আর তোমাদের তা বানাতেই পূর্ব কল্পের মতনই বাবা এসেছেন। জগতের লোকেরা তো শিবরাত্রি পর্ব মানায়। তারা আবার আজকাল কৃষ্ণরাত্রির কথাও বলছে। সাথে এও জানাচ্ছে- যদিও তাতে সামান্য তফাৎ আছে। একমাত্র তোমরা বাচ্চারাই এই রহস্যটাকে জানো। কৃষ্ণের জন্ম -দিনেই হোক্ বা রাতে হোক্, তাতে কি আসে যায় ? বাস্তবে কৃষ্ণরাত্রি পালন করা সম্পূর্ণরূপেই ভূল। রাত্রি তো হয় একমাত্র শিবের। কিন্তু এসব কথা তো বেহদের বিষয় - যা স্বয়ং শিববাবা শোনান। কিন্তু ভুলবশতঃ জগতের লোকেরা শিবকে ভুলে গিয়ে, শিবের নামের বদলে কৃষ্ণের নাম পুঁথিতে লিখেছে। রাত সম্পূর্ণ হলে তবেই তো দিনের শুরু হবে। বাবা তো আসেন বেহদের দিন তৈরী করার জন্য। যা ব্রহ্মার দিন আর রাত। কিন্তু এই ব্রহ্মা আসেন কোত্থেকে ? উনি তো কোনও (মানুষের) গর্ভ থেকে আসেন না। তবে ব্রহ্মার মাতা-পিতা কারা ? এও এক বিচিত্র ব্যাপার ! এই (শিব) বাবা-ই তাকে পোষ্য নেন, ব্রহ্মাকেই ওনার মা বানান আবার তার বাচ্চাও বানান। আর এই ব্রহ্মা মা আবার তোমাদের পোষ্য নেন। তাই তো এমন গীত গাওয়া হয়, "তুমিই মাতা আবার পিতাও তুমি ..... আমরা আত্মারা সবাই আপনারই সন্তান ।" আত্মারা পাঠ পড়ে এবং শোনে তাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। কিন্তু যেইমাত্র দেহ-অভিমান ভাবে আসে বাচ্চারা তা ভুলেই যায়। তাই তো বাবা ব্যাখ্যা করে বোঝান, তোমরা আত্মারা প্রকৃত অর্থে অবিনাশী, কিন্তু তোমাদের দেহ বিনাশী। অতএব আত্মারা

তোমরা তোমাদের প্রকৃত বাবা পরমাত্মাকে অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো। যেহেতু এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম- যা হীরের চাইতেও মূল্যবান (জন্ম)। কিন্তু যে বাবাকে একান্ত আপন করে নেয়, কেবল তার জন্মই হীরে তুল্য হতে পারে। তোমাদের দেহ-মন ও আত্মার সবকিছুই যেন এখন পরমপিতা পরমাত্মার হয়ে যায়। যাতে আত্মা হীরের মতন হতে পারে, অর্থাৎ যেমন ২৪-ক্যারেটের খাঁটি সোনা। যেখানে তোমাদের আত্মার গুণ এখন কোনও ক্যারেটেই নেই। তোমরা বাচ্চারা বাবার সম্মুখে বসে একান্ত চিত্তে যখন মুরলী শুনতে থাকো, তোমাদের মন তখন কেবল 'মধুবন'-এর দীপ্তিতে দীপ্যমান থাকে। আবার যদি কখনও বাবা এদিক-ওদিক কোথাও যায়, তখন কিন্তু তেমন অতিন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হয় না। ঠিক তেমনই হয়, যখন তোমরা মুরলী শোনার পরেই তোমাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদিদের কাছে অর্থাৎ মায়ার রাজ্যে চলে যাও। এখানে তোমরা বি কে-রা একত্রে থাকার ফলে 'ভাট্টী'-তেই থাক। এখানকার এই পাঠ তো রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে। তোমাদের থাকার জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থাও আছে। ব্রাহ্মণ পরিবারের যেমন অনেকে থাকতে পারে তেমনি বাইরের থেকেও কত লোক এসে থাকে এখানে। আর তোমরা এখন এখানকার পাঠশালাতে বসে আছো। জগৎ-সংসারের কোনও কারবারই নেই এখানে। নিজেদের মধ্যেই জ্ঞান-রত্নের আদান-প্রদানের আনন্দে বিভোর থাকো। তাই জগতের সবাই একদিকে-আর তোমরা অপরদিকে।

বাবা বসে তাই বোঝাচ্ছেন- আত্মাদের অতি প্রিয় প্রেমিক একজনই। সেই এক পরমাত্মাকেই আত্মারা স্মরণ করে। ভক্তি-মার্গের লোকেরা কত অসুখী, মতিভ্রমে তারা কেবল এদিক-ওদিক দৌড়তে থাকে দিশোহারা হয়ে, নিরাকার বাবার সাক্ষ্যাতের জন্য। কিন্তু সত্যযুগে দিশেহারা হয় না তারা। এখন তো আবার নুতন নুতন আরও কত প্রকারের চিত্র ইত্যাদিও বানিয়েছে তারা। যাদের যা মনে হয়েছে - তারা সেরকমই বানিয়েছে। ভক্তি-মার্গের গুরুদেরও কত মান-সন্মান। অন্যেরা মনে করে, তাদের যেমন গুরু থাকে, এখানেও তেমনি নিশ্চয় কোনও গুরু থাকবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, 'সাধু বাসবানী' তার জীবনের প্রথম দিকে শিক্ষক ছিলেন, পরে ধার্মিক সাধু হয়েছিলেন। তিনি গরীবদের খুব সেবা করতেন। আর তার কাছে কত লক্ষ-লক্ষ টাকাও আসতো। অন্যদেরও তেমনি ধারণা-বাসবানী সাধুর আশ্রমের মতনই তোমাদের এই আশ্রম। অবশ্য তোমরা তা জানো, এখানে তো স্বয়ং শিববাবা আসেন ব্রহ্মার শরীরকে আধার করে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারীর প্রয়োজন। যারা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী হবে এবং রুদ্র-যজ্ঞের রচনায় অংশ গ্রহন করবে। যেহেতু তা রুদ্র-শিববাবার যজ্ঞ। অতএব এখন কেবল একজনকেই স্মরন করে যেতে হবে। এই সৎসঙ্গ এমনই, যেখানে সাধারণ মানুষকে দেবতা বানানো হয়। এমনটি আর অন্য কোনও সতসঙ্গ নেই যেখানে মানুষদেরকে দেবতা বানানো হয়।।একমাত্র তোমরাই সেই আশীর্ব্বাদী বর্সা পেয়ে থাকো, যার ফলে তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের রাজ্য-ভাগ্য পাও। তোমাদের কথা শুনে অজ্ঞানী মানুষেরা প্রথমে হেঁসে ফেলে আর বলে, তা কি করে সম্ভব। কিন্তু যখন পুরো বিষয়টা শোনে, তারপর বলে, তোমরা বি কে-রাই সঠিক। সত্য শিববাবা ভগবানই একমাত্র বাবা, তোমরা যার থেকে আশীর্ব্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো। তবেই তো তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারো। কিন্তু দেখো, এখন তোমাদের কি দুর্দশা। যাকেই দেখবে তাকেই বলো- এই শিববাবাই সেই পরমাত্মা বাবা, যিনি স্বর্গের রচনা করেন, তবে তোমরা সেই স্বর্গ-রাজ্যে অধিকারী কেনই বা হবে না। কেন এভাবে নরকে থেকে নরক ভোগ করছো ! বর্তমানের এই দুনিয়াটা তো রাবণের রাজ্য। কিন্তু সত্যযুগে তো আর রাবণের অস্তিত্ব থাকে না। সেখানে অহিংসাই পরম ধর্ম। যাকে বিষ্ণুপুরী বলা হয়। কিন্তু তারা এটাও জানে না যে, বিষ্ণুপুরী অর্থাৎ স্বর্গপুরী। বাচ্চারা তোমরা তা জানো, সেই বিষ্ণুপুরীতে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই বাবা এসে আমাদেরকে

এই জ্ঞানের পাঠ পড়ান। তাই বাবা বলছেন, তার জন্য দরকার নিরন্তর ওনাকে স্মরণ করা। পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং এসে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরের দ্বারা তাদের নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের দ্বারা এই সব সমাধা করান। (পুঁথিতেও) যা পরিস্কার ভাবে লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরী-ই বলো বা কৃষ্ণপুরী বলো, ব্যাপার তো একই। লক্ষ্মী-নারায়ণ শৈশবে তারা রাধা-কৃষ্ণ। আবার এই প্রজাপিতা ব্রহ্মাও তো সাকারী দুনিয়ার। যখন উনি সূক্ষ্মবতনে থাকেন তখন ওনাকে প্রজাপিতা বলা যায় না। এই প্রজাপিতার দ্বারাই তোমাদেরকে পোষ্য নেওয়া হয়। পরে (শিব) বাবা তোমাদের নিজের করে নেন। কত সহজ-সরল কথা এটা। তোমরা নিজেদের ঘরে কেবল ত্রিমূর্ত্তির ছবি রাখো। এতে সেসব লেখাই থাকে। এ কথা প্রচলিতও আছে, ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, কিন্তু ত্রিমূর্তি-ব্রহ্মা বলাতেই তারা শিববাবার নামকেই লুপ্ত করে দিয়েছে। তোমরা এখন তা বুঝতে পারছো, শিববাবা তো নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, আর এই প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো সাকারী। ব্রহ্মাকে দেবতা বলা হয়। কিন্তু দেবতা তখনই বলা যাবে, যখন উনি সম্পূর্ণরূপে ফরিস্তা হন। তোমাদেরকেও এখন দেবতা বলা যাবে না। দেবতা অর্থাৎ সত্যযুগের বাসিন্দা। তখন তোমাদের হবে দৈবী ধর্ম। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর দেবতায় নমঃ- এমনটাই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ব্রহ্মা পরমাত্মায় নমঃ- তা কিন্তু বলা হয় না। তারা এদেরকে যেখানে দেবতা বলছেন, তারপরেও নিজেদেরকে পরমাত্মা বলেই বা কিভাবে ! সবাই কি তবে পরমাত্মা স্বরূপ ? তাই বা হয় কিভাবে। এই ব্যাপারটাও অবিনাশী নাটকের চিত্রনাট্যে লিপিবদ্ধ আছে। তাই তাদেরকেও দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু, এমত অবস্থায় তাদেরকে সঠিক দিশা দেখাবেই বা কি প্রকারে। ভক্তি-মার্গের ভক্তরা যে সব কিছুই অস্মরণ হয়ে আছে। উল্টে তারাই কত প্রকারের রাস্তাও বলে দেয়। বাবা তাই আবার ব্যাখ্যা করে জানাচ্ছেন, মৃত্যু যে প্রায় তোমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, এমত অবস্থায় তোমরা যদি বাবার থেকে আশীর্ব্বাদী-বর্সা নিতে চাও, তবে বাবার সেই বর্সা পাবে ব্রহ্মার মাধ্যমে। ব্রহ্মার মাধ্যম ছাড়া শিববাবার আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাওয়া সম্ভব নয়। যদিও সবাই তাদের অতি প্রিয়তম প্রেমিক সেই এক শিববাবাকেই বলে থাকে। বাবা বলছেন, "প্রতি কল্পের সঙ্গম-যুগেই আমি আসি। আমি অতি ক্ষুদ্র এক বিন্দু-স্বরূপ। তবুও দেখো, তারা কত ভাবেই আমার বিচার করে।" এই ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যেই কত বিশাল অবিনাশী পার্ট ভরা থাকে। এটাই খুব আশ্চর্যের ব্যাপার। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন স্মরণের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেকে আত্মা ভেবে, মনে প্রেম ভাব রেখে, একমাত্র বাবার সাথেই যোগযুক্ত হতে হবে। বর্তমানের এই দুনিয়া এখন তোমাদের উপযুক্ত নয়, তাই একে বুদ্ধি থেকে ঝেড়ে ফেলে সব কিছুকেই ভুলে থাকতে হবে।

২) নিজের জীবনকে হীরে তুল্য বানাবার লক্ষ্যে একমাত্র এই বাবার প্রতি সম্পূর্ণ রূপে উৎসর্গ করতে হবে। আর এই পাঠ পাকা করতে হবে যে, "আমার তো কেবল এই এক বাবা, অন্য আর কেউ নেই।"

বরদান :- এই সঙ্গমযুগের প্রতিক্ষণ, প্রতিটি সংকল্প, প্রতি সেকেন্ডকেই সমর্থ বানাতে পারা জ্ঞান-স্বরূপ ভব

বিস্তার:- জ্ঞান শোনা আর শোনানোর সাথে সাথে নিজেকেও জ্ঞান-স্বরূপে পরিণত করো। জ্ঞান-স্বরূপ সে হতে পারে, যার প্রতিটি সংকল্প, বাক্য আর কর্ম সমর্থ হয়। মুখ্য বিষয় হলো-সংকল্পরূপী বীজকে সমর্থ বানানো। আর যদি সংকল্পরূপী বীজ সমর্থ হয়, তবে বাণী, কর্ম, সম্বন্ধ অতি সহজেই সমর্থ হয়ে যায়। জ্ঞান স্বরূপ অর্থাৎ প্রতিক্ষণ, প্রতিটি সংকল্প, প্রতি মুহূর্তই সমর্থ হয়। যেমন আলো থাকলে অন্ধকার থাকে না-তেমনি তুমিও সমর্থ হলে তখন আর কোনও ব্যর্থতাও থাকবে না।

স্লোগান :- সেবা-কার্যে সদা 'জী হাজির' অর্থাৎ আমি প্রস্তুত এই অবস্থায় থাকা--যা প্রীত ভাবের প্রকৃত লক্ষণ।